স্মরণাঞ্জলি

শার্লট সেভিয়ার ও মায়াবতীর কাহিনি

চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘন জঙ্গলে ঘেরা জনমানবহীন আশ্রম প্রান্তর। নিশ্ছিদ্র আঁধার গ্রাস করেছে অদূরের শুভ্র শিখরশ্রেণিকে। পাহাড় জঙ্গলের গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা ছায়াময় প্রকৃতির দিকে চাইতে ভয় করে। চারিদিকের অখণ্ড নিস্তব্ধতা যেন মহা ব্রহ্মাণ্ডের স্মরণ করায়, যা ক্বচিৎ ভঙ্গ হয় সুদূরের কোনও রাতজাগা পাখির ডাকে। তারই মাঝে তমসাচ্ছন্ন এক প্রাচীন গৃহের কক্ষে এক মধ্যবয়স্কা বিদেশিনী, ফায়ারপ্লেসের পাশে কেরোসিন বাতির আলোয় আত্মমগ্ন হয়ে ধর্মগ্রন্থ পড়ছেন। অগ্নিশিখার আলোকে দীপ্ত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাঁকে! পরনে আটপৌরে শাড়ি। বুদ্ধিদীপ্ত মাতৃসুলভ কমনীয় মুখ থেকে ঝরে পড়ছে পরিতৃপ্তি আর প্রশান্তি। সেখানে কোনও ভীতি, অনিশ্চয়তা ও অভাববোধের লেশমাত্র নেই।

শার্লট সেভিয়ার। জীবনের অপরাহ্নকালে এসেছেন হিমালয়ের কোলে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের অদ্বৈত আশ্রম গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে। পরে ১৯০১ সালে তিনি ইংল্যান্ডে গেলে মায়াবতীতে তাঁর অভাববোধের কথা স্বামীজী এক পত্রে (২৫ সেপ্টেম্বর) সিস্টার ক্রিস্টিনকে লিখেছিলেন, ‘‘I am soon expecting Mrs. Sevier though. Her work is needing her. Her beautiful home in the Himalayan forests is a temptation, especially now when a huge tiger is roaming in her compound and killed a horse, a buffalo, and her pair of mastiffs in broad daylight; a number of bears [are] playing havoc with her vegetable garden; and lots of porcupines [are] doing mischief everywhere!!! She went out of the way to buy land in a forest—she and her husband liked it so much.’’[১]

শার্লটের জন্ম ১৮ অক্টোবর ১৮৪৭, লন্ডনের অনতিদূরে মন্টপেলিয়ার লন, চেলটেনহ্যামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। সেইসময় চেলটেনহ্যাম ছিল অর্থে, প্রতিপত্তিতে ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে পূর্ণ এক উন্নত উপনগরী। এমনই এক উজ্জ্বল পরিবেশে মেরি ক্যানী স্ট্যানটন লিংউডের কন্যা শার্লট

এলিজাবেথ লিংউড পৃথিবীর আলো দেখলেন। বাবা রবার্ট সোল লিংউড কর্মঠ, পরিশ্রমী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। ফরওয়ার্ড ব্লকের বহু আন্দোলনের সঙ্গে প্রায় পঁচিশ বছর যুক্ত ছিলেন তিনি। মাত্র ষাট বছরেই তাঁর দেহাবসান হয়। পিতার ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত করেছিল শার্লটকে। এক সচ্ছল বৃহৎ পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন তিনি। বাড়িতে গভর্নেসের কাছে শিক্ষা অর্জন করেন। প্রসঙ্গত, তাঁর থেকে সাঁইত্রিশ বছরের বড় ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলও ইংল্যান্ডে এই একই সময়ের শিক্ষা- সংস্কৃতির আবহে বেড়ে উঠেছিলেন ও আত্মনিয়োগ করেছিলেন মানবসেবায়। সেই সূত্রেই গবেষিকা অমৃতা এম সাম বলেছেন, ''Florence Nightingale became a role model for women who wished to work outside the home; Charlotte Sevier would become a role model for Western women who identified with an Eastern philosophy, lived in India or dedicated themselves to the ideals of Vedanta.''[২]

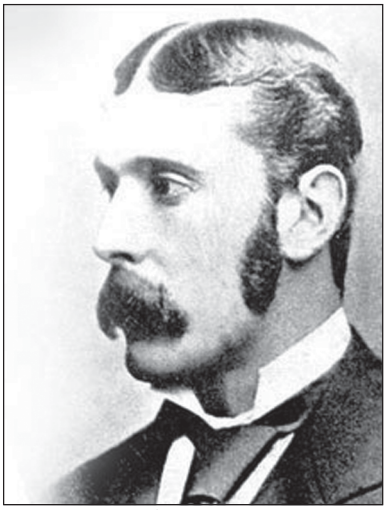
ক্যাপ্টেন সেভিয়ার

ভিক্টোরিয়ান যুগের সম্ভ্রান্ত, মার্জিত রুচিসম্পন্না, শিক্ষিতা শার্লট বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের সোনার কাঠির স্পর্শে হলেন অন্তর্মুখী, দীক্ষিত হলেন মানবধর্মে—মাতৃত্বের স্নিগ্ধ লাবণ্যে হলেন পরিপূর্ণ! স্বামীজীকে পুত্রস্নেহে গ্রহণ করে কাছে টেনে নিলেন তাঁর একান্ত প্রিয় ভারতের দীন অসহায় দুঃখী মানুষগুলিকে। সেটা ১৮৯৬ সালের জুন মাস। স্বামীজী তাঁর প্রথম বিদেশ যাত্রার দ্বিতীয় পর্যায়ে লন্ডনে এসেছিলেন। শার্লট ও তাঁর স্বামী জেমস্ হেনরি (যাঁকে হ্যারিও বলা হত) সেভিয়ার সাউথ হ্যাম্পস্টেডের একটি উচ্চবিত্ত পাড়ায় থাকতেন। শার্লটের বয়স তখন ঊনপঞ্চাশ ও হেনরির একান্ন। হেনরি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে কাজ করেছিলেন বলে তাঁকে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারও বলা হত। তাঁরা 'যথার্থ সত্যে'র সন্ধানে রত ছিলেন। 'মাদ্রাজ টাইমস্' পত্রিকা জানায় যে এই কারণে বিগত বিশ বছরে তাঁরা কোনও বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করেননি। এমন সময় তাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা মুগ্ধ করে তাঁদের। তাঁরা উভয়ে স্বামীজীর অনুবর্তী হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। স্বামীজী শার্লটকে মাতৃসম্বোধন করলে সন্তানহীনা শার্লটের মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত হয়। স্বামীজী বলেন, ''Don't you feel like coming to India? If you do come, I will give you the very best of all that I have experienced.''[৩]

এক অদৃশ্য অমোঘ বন্ধনে বাঁধা পড়লেন তাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে, যা সম্পূর্ণরূপে বদলে দিল তাঁদের জীবন। ইতিমধ্যে নিরন্তর বক্তৃতার ফলে স্বামীজী ক্লান্তিবোধ করছিলেন। তাঁকে বিশ্রাম দিতে তাঁরা ছয় সপ্তাহের ইউরোপ ভ্রমণের আয়োজন করলেন ও তাঁর সঙ্গী হলেন। স্বামীজী সুইজারল্যান্ডে গিয়ে বিহ্বল হলেন, মনে পড়ল তাঁর একান্ত প্রিয় নগাধিরাজ হিমালয়ের কথা। এই সময় চারদিনের এক অভিযাত্রায় তাঁরা পৌঁছলেন ৭০৬০ ফুট উচ্চতার এক আলপাইন মনাস্ট্রিতে, যেটি অগাস্টিয়ান ক্যাননদের দ্বারা পরিচালিত হত। তুষারশিখরে লিটল সেন্ট বার্নাড-এর গিরিপথে

স্বেচ্ছাসেবী সন্ন্যাসীদের দ্বারা দুর্গম অঞ্চলের অসহায় মানুষের সেবাকার্যের ঐকান্তিক নিষ্ঠা স্বামীজীর হৃদয় স্পর্শ করল।[৪] ভবিষ্যৎ মায়াবতীর বীজ উপ্ত হল মনে।

স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল হিমালয়ের কোলে গড়ে তুলবেন এক বেদান্তকেন্দ্র, যেখানে তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনুগামীরা একসঙ্গে থাকবেন, মনন করবেন আর লিপ্ত থাকবেন জনহিতকর কাজে। এই স্বপ্নপূরণের জন্য সেভিয়ার দম্পতি তাঁদের সর্বস্ব বিক্রি করে দিয়ে ভারতে চলে আসতে চাইলেন। তাঁরা তাঁদের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অর্থ দিয়ে দিতে চাইলেন এই কাজে। কিন্তু স্বামীজী পরামর্শ দিলেন ভবিষ্যতে তাঁদের নিজেদের প্রয়োজনে কিছু অর্থ রেখে দিতে।

শার্লট সেভিয়ার

অবশেষে স্বামীজীর ভারতে ফেরার দিন ঘনিয়ে এল। পশ্চিমি স্বাচ্ছন্দ্যে আজন্ম লালিত সেভিয়ার দম্পতি স্বামীজীর সঙ্গে পা বাড়ালেন এক পরাধীন দরিদ্র দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার আকাঙ্ক্ষায়। ভারতে এসে প্রতি পদে সংবর্ধিত হতে থাকলেন স্বামীজী ও তাঁর অনুগামীরা। হেনরি এবং শার্লট উভয়কেই সময়ে সময়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হল। হেনরি তাঁর হিন্দুধর্ম গ্রহণের কারণ উল্লেখ করলেও শার্লট রইলেন শান্ত, সংযত। তিনি নিজের প্রসঙ্গে শুধু জানালেন, ''Only a plain woman and could say nothing which was of much interest of importance to them.''[৫] একথা বলে তিনি সম্ভ্রমের আব্রু দিয়ে ঢেকে তাঁর উজ্জ্বল কমনীয় ব্যক্তিত্বকে আড়াল করলেন, যা ছিল ভিক্টোরিয়ান যুগের নারীদের বৈশিষ্ট্য।

প্রথমবার বিদেশ থেকে ফিরে এই পর্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর উচ্ছ্বসিত দেশবাসীকে ধর্মের নামে অবিরত যে-বার্তা দিয়েছিলেন তা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক সংস্কারে পরিপূর্ণ পূজা-অর্চনা থেকে ভিন্ন। তিনি সর্বতোভাবে জোর দিয়েছিলেন মানুষ তৈরির শিক্ষায়, যা তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগাবে, আনবে জাতীয় সচেতনতা, পরাধীন দেশের রুখে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তখন যা ছিল সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। স্বামীজীর সেই ভাবনা কিছুটা বাস্তবায়িত করেছিলেন সেভিয়ার দম্পতি ও পরবর্তী কালে একাকিনী মিসেস সেভিয়ার, তাঁর অরণ্যে ঘেরা ও পাহাড়ি শিখরমালার ছায়ায় গড়ে ওঠা সাধের মায়াবতী আশ্রমে।

ইতিমধ্যে স্বামীজীর অনুরোধে তাঁর বন্ধু লালা বদরি শাহ সেভিয়ার দম্পতির জন্য আলমোড়ার 'থম্পসন হাউস'-এ ভাড়া থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে তাঁরা এক বছরেরও বেশি সময় থাকেন। স্বামীজী ওই সময় তাঁদের অনুরোধে কিছুদিন তাঁদের সঙ্গে থাকেন। ওই সময়, অর্থাৎ ১৮৯৮ সালের মে মাসে স্বামীজী সেভিয়ার দম্পতিকে নিয়ে প্রায় এক সপ্তাহ জমির খোঁজে ঘুরেও মনের মতো কিছু পেলেন না। এমন সময় স্বামীজী গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ পান। আর খবর আসে তাঁর আর এক ভক্ত বি আর রাজম্ আইয়ারের চলে যাওয়ার, যিনি তখন 'Prabuddha Bharata' বা 'Awakened India'-র সম্পাদক ছিলেন। স্বামীজী, সেভিয়ার দম্পতি ও স্বামী স্বরূপানন্দের সাহায্যে এ-পত্রিকাকে

বাঁচিয়ে রাখতে চান। সেভিয়ারদের জানান বুদ্ধিমান ও উচ্চশিক্ষিত স্বরূপানন্দজীর কথা, যিনি তখনকার এক উচ্চমানের পত্রিকা 'Dawn'-এর সম্পাদক ছিলেন। সেভিয়ার দম্পতির পক্ষে স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস করে কোনও দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে হলে একমাত্র হিমালয়ের জলবায়ুই উপযুক্ত—একথা স্বামীজী বুঝেছিলেন। তাই তাঁর পরামর্শমতো 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর নতুন জীবন আরম্ভ হল আলমোড়ায়। পত্রিকার গোটা প্রেস রেল ও গাড়িপথে প্রায় পনেরোশো মাইল দূরত্ব পেরিয়ে মাদ্রাজ থেকে স্থানান্তরিত হল আলমোড়ায়, সমস্ত ব্যয় বহন করলেন ক্যাপ্টেন সেভিয়ার। ঠিক দুমাসের মধ্যে আগস্ট ১৮৯৮-এ প্রবুদ্ধ ভারতের নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হল, সম্পাদকের পদে রইলেন স্বামী স্বরূপানন্দ আর ম্যানেজারের পদে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার।

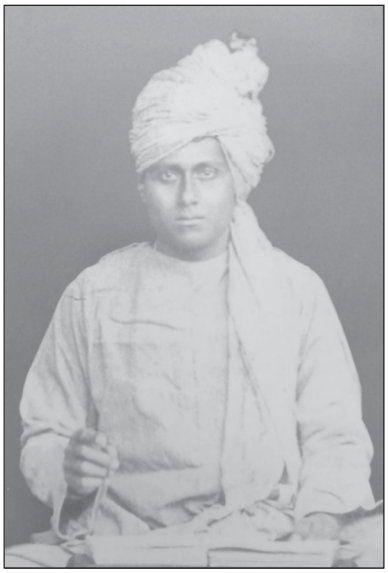

স্বামী স্বরূপানন্দ

অবশেষে জেনারেল ম্যাকগ্রেগর নামের এক স্কটিশের 'Glen Gyle' নামে চা-বাগানের জমি মিলল, যা ওই অঞ্চলের অত্যধিক আর্দ্রতার জন্য বন্যা ও খরায় ছিল বিপর্যস্ত। স্বামী স্বরূপানন্দ ও সেভিয়ার দম্পতি তিনজনেরই জমিটি পছন্দ হল। ২ মার্চ ১৮৯৯ সাত হাজার টাকায় তা কেনা হল, যার পাকা কাগজ শার্লটের হাতে এসে পৌঁছেছিল ২৩ জানুয়ারি ১৯০২।[৬]

অধ্যাত্মভূমি হিমালয়ের গ্রামবাসীরা একে 'মাইপাত' অর্থাৎ দেবস্থান বলত ও একটি গোল পাথরকে দেবতাজ্ঞানে ফুল নিবেদন করত। স্বামী স্বরূপানন্দ সেই জায়গার নাম রাখলেন 'মায়াবতী' অর্থাৎ মায়া বা মহামায়ার স্থান। আলমোড়া থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত এই স্থানটির উচ্চতা ৬০৪০ ফুট; তা ছড়িয়ে ছিল পঁচিশ একর কুমায়ুনি জংলি এলাকায়। সেখান থেকে আকাশের গায়ে দুধসাদা শিখরমালার অপরূপ দৃশ্য দেখা যেত। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই স্বরূপানন্দ সহ সেভিয়ার দম্পতি সেখানে চলে গেলেন ও জীবনের ন্যূনতম সুখ-সুবিধাগুলিকে বিসর্জন দিয়ে লেগে পড়লেন কাজে। জঙ্গলঘেরা প্রত্যন্ত জায়গায় পরিত্যক্ত চা-জমির স্থলে স্বামীজীর স্বপ্নের আশ্রম গড়ে তুলতে তৎপর হলেন। জগৎ-সংসারের চোখের আড়ালে আরম্ভ হল এক নতুন যুদ্ধ।

ঘন জঙ্গলে ঘেরা আঁধারপুরীতে ছিল মাত্র একটি বাড়ি, হয়তো ভৃত্যদের শোয়ার জন্য বাইরের দিকে কয়েকটি অস্থায়ী ঘর আর দুটি ছোট ঝিলের মতো জলাশয়। চা-পাতার প্রক্রিয়াকরণের কাজ হত জঙ্গলের মাঝের যে-দোতলা বাড়িটিতে, তাকে পরিমার্জিত করে আশ্রম গড়ার কাজ আরম্ভ হল। খাদ্য সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই অমিল, তবু 'স্বামীজীর কাজ' করে চলার আনন্দ তাঁদের সব কঠোরতা ভুলিয়ে দিত।

১৯ মার্চ ১৮৯৯, শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মতিথির দিন মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রমের স্থাপনা হল। প্রতিষ্ঠিত হল এমন এক উপাসনা মন্দির যেখানে কোনও বিগ্রহ থাকবে না, যেখানে অদ্বৈত ছাড়া সবকিছুর প্রবেশ নিষেধ![৭] প্রবুদ্ধ ভারতের প্রেসকে তুলে আনা হল আলমোড়া থেকে মায়াবতীতে। প্রেসের কাজকর্মের জন্য এলেন তিনজন। এছাড়া

দুজন রাঁধুনি ও একটি কাজের লোক। এই নিয়ে কর্মকাণ্ড আরম্ভ হলেও মালি, কুলি, কাঠমিস্ত্রি, নাপিত ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য তাঁরা চার থেকে ছয় কিলোমিটার দূরের গ্রাম থেকে লোক সংগ্রহে তৎপর হলেন। তারা কাজ পেয়ে খুশি হল আর তার চেয়েও বেশি খুশি হল ওই বনবাদাড়ের মাঝে শার্লটের মাতৃস্নেহের আশ্রয় পেয়ে।

আরও এক নতুন রূপে বিখ্যাত হতে আরম্ভ করলেন সেভিয়ার জননী। তিনি সঙ্গে করে প্রয়োজনীয় হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটি বাক্স এনেছিলেন। পাহাড়ি দরিদ্র মানুষকে তিনি তা থেকে ওষুধ দিতেন। আসার এক মাসের মধ্যেই তাঁর এই কাজ আরম্ভ হয়ে যায় আর ক্রমশই ওষুধের চাহিদা বাড়তে থাকে। পরে ১৯০৩ সালের নভেম্বর মাসে তিনি একটি দাতব্য ঔষধালয় খোলেন যা পরে মায়াবতী দাতব্য হাসপাতালে পরিণত হয়। সকলের প্রতি করুণার জন্য তিনি ধীরে ধীরে দেবীরূপে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম লাভ করেন। স্বামীজী সিস্টার নিবেদিতাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন (২৯ জুলাই ১৮৯৭), ''Mrs Sevier is a jewel of a lady—so good, so kind! The Seviers are the only English people who do not hate the natives,... Mr. and Mrs. Sevier are the only persons who did not come to patronise us...''[৮]

ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আলমোড়ায় চিকিৎসার জন্য গেলেন না। এ-প্রসঙ্গে তিনি বললেন, জীবনে তিনি কোথাও ছ-মাসের বেশি থাকেননি, অথচ মায়াবতীতে এসেছেন এই ভেবে যে মায়াবতী ছেড়ে তিনি কখনও যাবেন না। সেকথা রেখে স্বামীজীর প্রিয় 'হ্যারি' মায়াবতী থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যান—২৮ অক্টোবর ১৯০০, মায়াবতীতে আসার ঠিক দেড় বছর পরে।

স্বামীজীর হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মর্মাহত স্বামীজী প্রবল শীতে নিজের অসুস্থ শরীরের কষ্ট উপেক্ষা করে যাত্রা করেন মায়াবতীর উদ্দেশে। ৩ জানুয়ারি ১৯০১ তিনি প্রথমবার সেখানে পৌঁছন ও পনেরো দিন থাকেন। প্রয়াত ক্যাপ্টেন ও শার্লটের যত্ন ও পরিশ্রমে সাজানো মায়াবতীর রূপ মুগ্ধ করে তাঁকে। স্বামীজী মায়াবতীর বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেন আর ভাবেন—সেভিয়ার দম্পতি তাঁর মনের কথা এমনভাবে বুঝলেন কী করে! জীবনের প্রান্তবেলায় সব কাজ ছেড়ে শিশুর মতো নির্ভার মনে এই লেকের ধারে আনন্দে দিন কাটাবেন—এমনটি ভাবতেন স্বামীজী। কিন্তু তার আগেই তিনি চলে গেলেন মহাপ্রস্থানের পথে। রয়ে গেলেন তাঁর বিদেশিনী জননী শার্লট, একাকিনী—স্বামীজীর স্বপ্নকে আঁকড়ে, মায়াবতীর প্রত্যন্ত বন্য প্রান্তরে।

শুরু হল শার্লটের নতুন জীবনসংগ্রাম। স্বামী ও প্রাণপ্রিয় পুত্রকে হারিয়ে কর্মযোগী তিনি আবার লেগে পড়লেন মায়াবতীকে তিলে তিলে গড়ে তোলার কাজে। ১৯০৩-এর ১২ জুন উইল করে মায়াবতীর স্বত্ব হস্তান্তরিত করে দিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে।[৯] তখন মায়াবতী আশ্রম এলাকাটি তিনভাগে বিভক্ত ছিল। সবচেয়ে উঁচুতে ছিল আশ্রমগৃহের দোতলা বাড়িটি যেখানে সাধুরা থাকতেন ও পত্রিকার কাজ করতেন। এছাড়া দুটি বাড়ির মধ্যে উপরেরটি সূর্যের আলোকদীপ্ত থাকার জন্য শার্লটের 'শীতকালীন বাসস্থান' ছিল। গ্রীষ্মে সেটি পান্থশালারূপে ব্যবহৃত হত আর তখন শার্লট চলে আসতেন নিচের বাড়ির 'গ্রীষ্মকালীন বাসস্থানে'। যদিও নির্জন ভয়াবহ সে-তল্লাটে সাবধানতার কথা মাথায় রেখে তাঁর রাতের নিদ্রার ব্যবস্থা করা হয়েছিল মূল আশ্রমবাড়ির উপর তলার বাথরুম সংলগ্ন একটি কোণার ঘরে।

আশ্রমে শার্লটের দৈনন্দিন জীবনটি ছিল অভিনব, 'অদ্বৈতবাণী'র মন্ত্রে মোড়া। বৃদ্ধ বয়সে ও

মায়াবতী আশ্রম

নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে তাঁর শরীর ক্ষীণ হয়ে গেলেও তাঁর সদা হাস্যমুখ ও মাতৃত্বপূর্ণ আচরণ দিয়ে তিনি ভরিয়ে রাখতেন চারদিক। আশ্রমে শাড়ি পরতেন; ক্বচিৎ বাইরে কোথাও গেলে পরতেন পশ্চিমি বস্ত্র। ভোরে উঠে ধ্যান সেরে চলে যেতেন নিজের বাংলো বাড়িতে। একটি ভৃত্যের সাহায্যে সমস্ত ঘরের কাজ সারতেন নিখুঁতভাবে। নিজের জন্য অল্প রাঁধতেন। কখনও আশ্রম থেকেও কিছু খাবার আসত তাঁর জন্য। প্রতিদিন কোনও এক আশ্রমবাসীকে আমন্ত্রণ জানাতেন তাঁর বিকেলের চায়ের আসরে। এছাড়া চলত গ্রন্থ সম্পাদনার কাজ নিরলসভাবে।

ইতিমধ্যে স্বামীজীর দেহাবসানের পর তাঁর ‘কমপ্লিট ওয়ার্কস’-এর কাজ আরম্ভ হয়। তার কিছুদিনের মধ্যেই প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক স্বরূপানন্দজীর অকাল প্রয়াণ ঘটে। পুত্রস্নেহে আগলে রেখেছিলেন যাঁকে, সেই কর্মকুশল উৎসাহী ছেলেটির প্রয়াণে ভেঙে পড়েন শার্লট। কিন্তু আবার তাঁকে উঠে দাঁড়াতে হয়। এবার সেই কার্যভার ন্যস্ত হয় স্বামী বিরজানন্দের উপরে। ততদিনে প্রথম খণ্ডের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, শুধু প্রকাশিত হওয়া বাকি। এঁদের নতুন দেখাশোনায় এগোতে থাকে কাজ। স্বামী বিরজানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের ভাব বা বক্তব্যের যথার্থতাকে ধরে রাখতে যত্নশীল হন আর শার্লট তাঁর ভাষাকে। স্বামীজী-মুগ্ধ বিদেশিনী বলেন, ‘‘To bring from Swamiji’s mouth such English, which people will criticize, is certainly not proper!’’[১০] অতঃপর মাতা-পুত্রের পরিশ্রম ও স্বামীজীর প্রেমের জোয়ারে এগিয়ে চলে কাজ।

যখন ‘কমপ্লিট ওয়ার্কস’-এর পঞ্চম খণ্ড শেষের মুখে তখন বিরজানন্দের মাথায় স্বামীজীর জীবনী লেখার চিন্তা আসে এবং শার্লটের উৎসাহ ও আগ্রহে তা আরম্ভ হয়। বিরজানন্দ তথ্য সংগ্রহে তৎপর হন, লেখানো হয় ফ্রান্সিস (ফ্রাঙ্ক) আলেকজান্ডার নামের এক আমেরিকান ভক্ত লেখককে দিয়ে, যিনি তখন মায়াবতীতে ছিলেন। সম্পাদনার দায়িত্বে থাকেন শার্লট। ফ্রাঙ্ক ভারতীয় দর্শনে আগ্রহী হলেও ভারতের রীতি-নীতি সঠিক না জানায় সে-লেখা ঠিক করতে শার্লটকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। করতে হয় প্রভূত সংশোধন। এইভাবে স্বামীজীর অতিপ্রিয় হিমালয়ের কোলে গড়ে ওঠে ‘The life of Swami Vivekananda’ ও তাঁর ‘Complete Works’-এর খণ্ডগুলির প্রথম সংস্করণ। The Life সার্বিকভাবে প্রশংসিত হলে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩-র এক পত্রে অখণ্ডানন্দজী বিরজানন্দকে লেখেন, ‘‘It seems that through the sincere efforts of you all and through Mother Sevier’s boundless devotion, Swamiji has poured his own spirit into the Life... Tell Mrs. Sevier, on

my behalf, that Swamiji's Life, as published by Advaita Ashrama, is without parallel."[১১]

ভালবাসা ও মাধুর্যের প্রতিমূর্তি ছিলেন শার্লট। পশুপাখি ও নিকট-দূরের সকলেই ছিল তাঁর স্নেহের ভাগীদার। তাঁর যেমন ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি তেমনি করুণায় ভরা হৃদয়। নিবেদিতা, জোসেফিন ম্যাকলাউড, ক্রিস্টিন সবাই এসেছেন মায়াবতীতে, তাঁর উষ্ণ আতিথ্যে সময় কাটিয়ে ফিরে গেছেন। শার্লট থেকে গেছেন একাকিনী, স্বামীজীর আদর্শকে সঙ্গী করে, কুমায়ুনের অপরূপ হিমালয় ও ঘন জঙ্গলে ঘেরা নির্জনবাসে নিরবচ্ছিন্নভাবে। একবার জোসেফিন সেখানে থাকাকালীন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এত শান্ত নির্জন প্রান্তে থেকে তিনি কি ক্লান্ত হন না? উত্তরে শুধু তিনি বলেছিলেন, ''I think of him [Vivekananda]."[১২]

বয়সের ভারে শরীর হয়ে পড়ছিল ক্ষীণ। অবশেষে ১৯১৬ সালে জীবনের শেষপ্রান্তে তিনি ইংল্যান্ডের পথে পাড়ি দিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন আজীবন। ২০ অক্টোবর ১৯৩০ তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

দান-ধ্যান, সেবা ও কীর্তি অমরত্ব দিয়েছে মিসেস সেভিয়ারকে। মায়াবতীতে ডায়রির ৩০ নভেম্বর ১৯১৩-র পাতায় লেখা আছে :

''Mother [Sevier] spent all this money [about Rs. 4500] and suffered endless trouble and disturbances only to have the Life of Swamiji finished by him [Frank]. Blessed be Mother, and her devotion to Swamiji!"[১৩]

জননীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন শার্লট, পেয়েছিলেন মায়ের আসন। বিরজানন্দ একবার আবেগভরে তাঁকে স্মরণ করে বলেছিলেন, তিনি তিনজন মাকে পেয়েছেন : গর্ভধারিণী, শ্রীশ্রীমা এবং মিসেস সেভিয়ার।[১৪] কুমায়ুনের পাহাড়ি গ্রাম্য মানুষদের চোখে তিনি ছিলেন দেবী। স্বামীজী যথার্থই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন : ''And that Mrs. Sevier, because she did not care for honors, has the worship of thousands today; and when she is dead millions will remember her as one of the great benefactresses of the poor Indians."[১৫] ✠

তথ্যসূত্র

১। *The Complete Works of Swami Vivekananda,* Advaita Ashrama, Kolkata, 2012, Vol. 9, p. 165

২। Amrita M. Salm, Ph. D., *Mother of Mayavati,* Advaita Ashrama, 2013, p. 29

৩। Editorial Adviser : Pravrajika Atmaprana, *Western Women in the Footsteps of Swami Vivekananda,* Ramakrishna Sarada Mission, New Delhi, 1995, p. 137

৪। দ্রঃ *Mother of Mayavati,* p. 35

৫। Ibid, p. 52

৬। দ্রঃ Ibid, p. 60

৭। দ্রঃ Ibid, p. 62

৮। *Complete works,*Vol. 7, 2012, p. 512

৯। দ্রঃ *Mother of Mayavati,* p. 106

১০। Ibid, p. 114

১১। Ibid, p. 121

১২। Ibid, p. 109

১৩। Edited by Swami Satyapriyananda, *The Charm of Mayavati Ashrama,* Advaita Ashrama, 2009, p. 100

১৪। দ্রঃ *Mother of Mayavati,* p. 145

১৫। Ibid